দিনবদলের অঙ্গীকার পালনের ব্যাপারে কিছু অপ্রিয় পরামর্শ

কালের আয়নায়

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

আজ নতুন আওয়ামী লীগ সরকারকে কিছু অপ্রিয় পরামর্শ দিতে চাই। তারা শুনবেন এই আশায় দিতে চাই না। যেহেতু আমি এই সরকারের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই নিজের কর্তব্যবোধ থেকেই এই পরামর্শ দিতে চাই। তারা শুনবেন কি শুনবেন না, সেটা দেখার দায়িত্ব আমার নয়। আবহাওয়াবিশারদরা দুর্যোগময় আবহাওয়া সম্পর্কে আগেভাগে পূর্বাভাস দেন, সবাইকে সতর্ক করে দেন। দুর্যোগ ঠেকানো তাদের দায়িত্ব নয় এবং কেউ তাদের সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে বঙ্গোপসাগরে জেলে ডিঙ্গা ভাসালে তার পরিণতির জন্যও দায়ী হন না। একজন রাজনৈতিক কলামিস্ট হিসেবেও আমার দায়িত্ব, নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া, ঝড়-বন্যার আভাস পেলে তাকে ঠেকানোর দায়িত্ব আমার নয়; সে ক্ষমতাও আমার নেই। এই ঝড়-বন্যা ঠেকানোর দায়িত্ব যে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের, আমি শুধু তাদের পরামর্শ দিতে পারি। তারা শুনবেন কি শুনবেন না এটা তাদের আক্কেল ও বিদ্যাবুদ্ধি, দূরদর্শিতার ওপর নির্ভর করে।

আওয়ামী লীগের এবারের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রের নাম ছিল দিনবদলের সনদ। সোজা কথায় দিনবদলের অঙ্গীকার। আমেরিকায় প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে বারাক ওবামার স্লোগান ছিল চেঞ্জ বা পরিবর্তন। ওই স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ দিনবদলের (আসলে তারও অর্থ পরিবর্তন) কথাটি নির্বাচনী ঘোষণা হিসেবে হয়তো বেছে নিয়েছে। ওবামা এবং হাসিনা দু'জনেই নির্বাচিত হয়েছেন এবং বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন। ওবামা হয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এবং হাসিনা হয়েছেন জাতীয়ভাবে। দু'জনেই এই চ্যালেঞ্জ কতটা সফলভাবে মোকাবেলা করতে পারবেন, তা আমি জানি না। প্রেসিডেন্ট ওবামাকে ইতিমধ্যেই তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা হুশিয়ারি দিতে শুরু করেছেন। আমিও শেখ হাসিনার অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সময় থাকতে অর্থাৎ যাত্রা শুরুতেই তাকে এবং তার সরকারকে কিছু অপ্রিয় পরামর্শ ও সতর্কবাণী শোনাতে চাই। তারা শুনবেন কি শুনবেন না তা আমার বিবেচ্য নয়।

প্রথম কথা, দিনবদলের অঙ্গীকার পূরণ খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে বা বড় কাজ দ্বারা শুরু করার দরকার হয় না। খুব ছোট ছোট কাজ দ্বারা এই দিনবদলের যাত্রা শুরু করা যায়। ছোট কাজ দ্বারা যে বড় পরিকল্পনা শুরু করা হয়, সাধারণত তা সফল হয়। ঢাকঢোল পিটিয়ে কোনো বড় কাজ দ্বারা কোনো বড় অঙ্গীকার পালন করতে গেলে তা 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রি য়ায়' পরিণত হয়। কিন্তু ছোট ছোট কাজই বড় অঙ্গীকার পূরণে বড় সাফল্য এনে দেয়। এক্ষেত্রে শুধু চাই যারা অঙ্গীকার পালন করতে চান তাদের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা। এই আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা না থাকলে কেবল কথার তুবড়ি ফুটিয়ে কোনো লাভ হবে না। কোনো সাফল্যই অর্জন করা যাবে না।

১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্টের বিশাল বিজয়ের পর শেরেবাংলা ফজলুল হক প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন। তখন মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ছিল রমনায় অবস্থিত বর্ধমান হাউস, যা এখন বাংলা একাডেমীর ভবন। এই বর্ধমান হাউসেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বাস করেছেন। হক সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তার জন্য এই সরকারি বাসভবনটি বরাদ্দ করা হতো। তিনি সরকারি বাসভবনে না এসে পুরান ঢাকায় কেএম দাস লেনে নিজের বাসায় থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

শুধু তাই নয়, ১৯৫২ সালে যে সরকারি বাসভবনে বসে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন নির্মমভাবে রক্তপাত ঘটিয়ে ভাষা আন্দোলন দমনের চেষ্টা করেছেন, সেই ভবনে বাংলা একাডেমী করার প্রস্তাব দেন হক সাহেব। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে নূরুল আমীনের মুসলিম লীগ সরকারের ভরাডুবির কথা ঘোষিত হতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র পরাজিত মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক পরিত্যক্ত এই বাড়িটি দখল করে ছাত্রাবাস করার দাবি জানায়। ফজলুল হক তখনো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেননি, কিন্তু খবর পেয়েই বর্ধমান হাউসে ছুটে যান এবং ছাত্রদের কাছে বাড়িটিতে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত জানান। ছাত্ররা তার সিদ্ধান্তের কথা শুনে শেরেবাংলা জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে ওই ভবন ত্যাগ করে।

শুধু পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, হক সাহেব অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকারি বাসভবনে যাননি, দীর্ঘ ছয় বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কলকাতায় তার ঝাউতলা রোডের বাড়িতেই বসবাস করেছেন। তাকে অনুসরণ করে অবিভক্ত বাংলার পরবর্তী দুই প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় নিজ নিজ বাড়িতে বসবাস করেন। এমনকি ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ হওয়ার বেশ কিছুকাল পর সিপিএম নেতা জ্যোতি বসু যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন, তখন দীর্ঘ প্রায় তিন দশক তিনি নিজের বাড়িতেই থেকেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কলকাতায় তার স্ত্রীর যে ছোট বাড়িটিতে বসবাস করেন সেটি দেখলে রীতিমতো করুণা হয়।

১৯৫৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট একুশ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিল। হক সাহেব প্রকাশ্যে দিনবদলের কোনো ঘোষণা না দিলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে দিনবদলের পালা শুরু করেছিলেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিজের বাড়িতে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গভর্নরের কাছে শপথ গ্রহণের পর সরকারি দলিলে প্রথম সই করেন বাংলায়। সেটাই পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় কাজে প্রথম বাংলা ব্যবহার।

তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন উর্দুভাষী চৌধুরী খালেকুজ্জামান। তিনি হক সাহেবকে ইংরেজিতে সই করার অনুরোধ জানালে (তখনো বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি) হক সাহেব গভর্নরকে বলেন, 'পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫৬ ভাগ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা। এটা তো আসলে রাষ্ট্রভাষাই। এই ভাষাতে সই করাটাই আমি কর্তব্য বলে মনে করি।' এই জবাব শুনে চৌধুরী খালেকুজ্জামান নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন।

ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী হয়েই পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ বাংলা নববর্ষ উৎসব পালনকে স্বীকৃতি দেন এবং পহেলা বৈশাখকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন। দুই বাংলার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য তো তখন বন্ধই ছিল, সাংস্কৃতিক যোগাযোগও ছিল বিচ্ছিন্ন। কলকাতা থেকে ঢাকায় সাংস্কৃতিক সভা-সম্মেলনে আসার জন্যও পশ্চিমবঙ্গের কবি-সাহিত্যিকরা পাকিস্তানি ভিসা পেতেন না। ঢাকার কবি-সাহিত্যিকরাও কলকাতায় যেতে পাকিস্তান সরকারের রক্তচক্ষুকে ভয় করতেন।

ফজলুল হক একটি প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েও এই ভয় ভাঙানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিকদের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে কলকাতা থেকে মনোজ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়সহ এক ডজনের ওপর কবি-সাহিত্যিক যোগ দেন। ঢাকায় আসার জন্য তাদের যাতে ভিসা দেওয়া হয় সেজন্য হক সাহেব তার প্রভাব প্রয়োগ করেছিলেন।

দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর আগের এই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছি এই কথাটি বলার জন্যই যে, ঘটা করে দিনবদলের অঙ্গীকার বড় গলায় ঘোষণা না করেও ছোট ছোট কাজ দ্বারা সেই অঙ্গীকার পালন শুরু করা যায়; যেমন শুরু করেছিলেন পঞ্চাশের দশকের পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্টের হক মন্ত্রিসভা। একুশ শতকের ২০০৯ সালেও যুক্তফ্রন্টের ঐতিহ্যবাহী নির্বাচনী প্রতীক নৌকা নিয়ে বিশাল বিজয়ের অধিকারী আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় বসার প্রারম্ভেই ছোট ছোট কাজ দ্বারা তার দিনবদলের প্রতিশ্রুতি পালন শুরু করতে পারেন। এর একটি কাজ হতে পারে, হক সাহেব ও জ্যোতি বসুদের উদাহরণ অনুসরণ করে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকারি বাসভবন গণভবনে (পুরনো নাম) না গিয়ে তার নিজের বাড়ি সুধা সদনেই বসবাস করা।

এই প্রস্তাবটি জানাতে আমি কিছুটা ভয় পাচ্ছি। কারণ, ২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনা ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী থাকুন আর না থাকুন, গণভবনকে তার স্থায়ী বাসভবন করার সিদ্ধান্ত যখন তার মন্ত্রিসভা গ্রহণ করেছিলেন তখন আমি তাতে আরো কয়েকজনের মতো আপত্তি জানিয়েছিলাম এবং ঢাকার একটি কাগজে

একটি কলামও লিখেছিলাম। শেখ হাসিনার গণভবনে বাস করার ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। আমার ভয় ছিল, খালেদা জিয়া রাজনীতিতে নেমেও ক্যান্টনমেন্টের একটা বিশাল বাড়ির দখলিস্বত্ব নিয়েছেন এটা যেমন সঙ্গত নয়, তেমনি শেখ হাসিনারও জেনারেল পত্নীর অপদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ক্ষমতা ত্যাগের পরও প্রাসাদোপম সরকারি বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকা উচিত নয়। এটি একদিকে অসঙ্গত এবং অন্যদিকে জনসাধারণের চোখেও দৃষ্টিকটু ঠেকবে। গণভবনে শেখ হাসিনার স্থায়ীভাবে বাস করা নির্বাচনে ভোট-লুজিংয়েরও ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

আমার মতো আওয়ামী লীগের শুভাকাঙ্ক্ষী আরো কেউ কেউ এই ব্যাপারে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন (তাদের মধ্যে জননেত্রীর তখনকার অত্যন্ত কাছের মানুষ মোনায়েম সরকারও ছিলেন। বেচারাকে সে জন্য পরে যথেষ্ট মাসুল গুনতে হয়েছে)। আমাদের এই আপত্তিতে শেখ হাসিনা কতটা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন জানি না; কিন্তু তার তখনকার পরামর্শদাতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই ক্রোধের তাপ আমি লন্ডনে বসেও অনুভব করেছি।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় বসার পরও বোঝা গেল আমরা যারা শেখ হাসিনার গণভবনে স্থায়ীভাবে বসবাসের বিরোধিতা করেছি, তারা তার কতটা হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলাম। সুবিবেচনা, সহিষ্ণুতা, উদারতা এসব কথা বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতি চর্চার অভিধানে নেই। প্রতিহিংসা, আক্রোশ চরিতার্থ করা, শঠতা ও মিথ্যাচার হচ্ছে তাদের রাজনীতির ভূষণ। সন্দেহ নেই, হাসিনা যদি আগেই গণভবন বরাদ্দ নেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল না করে ওই ভবনে থাকতেন, তাহলে খালেদা-নিজামীরা ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গে হাসিনাকে অত্যন্ত অবমাননাকরভাবে ওই ভবন ছাড়তে বাধ্য করতেন।

শেখ রেহানার ঢাকায় থাকার সুবিধার জন্য হাসিনা সরকার তাকে একটি ছোট্ট বাড়ি বরাদ্দ দিয়েছিলেন। খালেদা জিয়ার তাও প্রাণে সয়নি। তিনি ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গে জাতির পিতার এক কন্যার জন্য এই বাড়ি বরাদ্দ বাতিল করে দেন এবং বাড়িটিতে একটি থানা বসানো হয়। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি এই ধরনের হিংস্র আক্রোশ চরিতার্থ করার নজির সভ্য দেশে খুব কমই আছে।

এখন যদি শেখ হাসিনা ক্ষমতায় বসে 'দেশনেত্রীর' একই প্রতিহিংসার রাজনীতি অনুসরণ করেন এবং ক্যান্টনমেন্টে তার অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বসবাসের অনুমতি বাতিল করেন, এমনকি 'জেনারেলের দুস্থ বিধবা' হিসেবে তাকে যে আরেকটি বাড়ি নামমাত্র মূল্যে দেওয়া হয়েছে, সেটিও ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাহলে কেমন হয়! আমার শুধু প্রত্যাশা নয় দৃঢ় বিশ্বাস, শেখ হাসিনা এই প্রতিহিংসার রাজনীতি অনুসরণ করবেন না। তিনি যখন দিনবদলের অঙ্গীকারই করেছেন, তাহলে খালেদা-শাসনের দিনগুলো যে তিনি বদলাতে চলেছেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি তার ব্যবহার ও আচরণের দ্বারাই তার প্রমাণ দিন। খালেদা-নিজামীরা যা করেছেন তার উল্টো কাজ ও আচরণ দ্বারা দিনবদলের অঙ্গীকার পালনে হাসিনা তার আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে পারেন।

কেউ কেউ বলতে পারেন, সুধা সদনে বসবাস করার সঙ্গে শেখ হাসিনার নিরাপত্তার প্রশ্নটিও জড়িত। বর্তমানে তার জীবনের ওপর হুমকি যে পরিমাণে বেড়েছে, ইতিপূর্বে বাংলাদেশের আর কোনো প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির জীবন ততটা হুমকির সম্মুখীন হয়নি। খালেদার তো নয়ই (বেহুদা তার চেলারা এখন কোনো ইস্যু না পেয়ে খালেদার বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর দাবিতে চিল্লাচিল্লি শুরু করেছে। হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলার পরও এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাকে তারা ক্ষমতায় বসে দেননি)। সুতরাং হাসিনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরকারি ও বেসরকারিভাবে নিশ্ছিদ্র করা দরকার এই কথাটা আমিও সম্প্রতি লিখেছি।

কিন্তু এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোনো ভবনে থাকার ওপর নির্ভর করে না। করে ব্যবস্থার ওপর। লিবিয়ার গাদ্দাফি রাষ্ট্রপ্রধানের সরকারি বাসভবনে না থেকে বিভিন্ন বেসরকারি বাড়িতে (এমনকি তাঁবুতে) রাত কাটাতেন বলে তাকে হত্যার বারবার মার্কিন চক্রান্ত ও হামলা থেকে বেঁচে যান। তার একটি সরকারি বাসভবনে বোমা মেরে তার ছয় বছরের পালিত কন্যাকে হত্যা করা গেলেও মার্কিনি বোমা তাকে হত্যা করতে পারেনি। অন্যদিকে চিলির প্রেসিডেন্ট আলেন্দে তার সুরক্ষিত প্রেসিডেন্সিয়াল ভবনেই বাস করার সময় দুর্বৃত্ত জেনারেল পিনোচেটের ষড়যন্ত্রে নিহত হন। আফগান প্রেসিডেন্ট সর্দার দাউদ খানকে সপরিবারে হত্যা করা হয় কাবুলের রাজপ্রাসাদেই। সুতরাং কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানের নিরাপত্তার ব্যবস্থাটি নির্ভর করে তিনি কোন ভবনে বাস করছেন তার ওপর নয়, নির্ভর করছে একটি সতর্ক ও নিশ্ছিদ্র শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর। এই ব্যবস্থাটি যদি করা যায়, তাহলে শেখ হাসিনা সুধা সদনেও নিরাপদ থাকবেন, আর ব্যবস্থাটি যদি ত্রুটিহীন না হয় তাহলে গণভবনে বাস করেও নিরাপদ থাকবেন না।

আমি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নিজের বাড়িতে থাকার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি এজন্যই যে, তিনি অতীতের নির্বাচিত ও গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রীদের সহজ-সরল জীবনযাপনের স্টাইল ও ঐতিহ্য বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনুন। দিনবদলের অঙ্গীকার এখান থেকেই শুরু হোক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর অফিসের পরিসর ও দায়িত্ব বেড়ে যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর দফতর প্রথমে পুরনো গণভবনে এবং পরে দ্বিতীয় গণভবনে স্থানান্তর করেন। কিন্তু সেখানে বিশ্রামাগার রেখেছেন, তাকে বাসভবন করেননি। তিনি সপরিবারে বত্রিশ নম্বর বাড়িতেই বাস করতেন এবং সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন।

সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসনামলে বাংলাদেশের মতো গরিব দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিদের ঠাটবাটের ব্যয়বহুল চলাফেরা শুরু হয়। এরশাদ তো প্রচুর অর্থ ব্যয়ে একটি ভবন তৈরি করে তার ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদকে নাকি বলেছিলেন, এটি তার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এরশাদের পতনের পর খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রীতিমতো প্রেসিডেন্সিয়াল জাঁকজমকে চলাফেরা শুরু করেন। তিনি এরশাদের তৈরি বাড়িটিকেও প্রধানমন্ত্রীর অফিস করে ফেলেন এবং সৌদি বাদশাদের কায়দায় সকালে এক ভবনে, সন্ধ্যায় আরেক ভবনে বসে প্রধানমন্ত্রীর কাজ সারতে শুরু করেন।

আমি শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানাই, তিনি যদি সত্যই দিনবদলের অঙ্গীকার পালন করতে চান, তাহলে বাংলাদেশের মতো গরিব দেশে জনগণের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর রাজা-রানীর স্টাইলে প্রধানমন্ত্রিত্ব করার রেওয়াজটি অবিলম্বে বর্জন করে গণপ্রতিনিধির স্টাইলে করার পুরনো ট্রাডিশন ফিরিয়ে আনুন এবং একাধিক প্রাসাদোপম ভবন অনাবশ্যকভাবে ব্যবহারের বিলাসিতা ও ব্যয়বাহুল্য বর্জন করে এই ভবনগুলোকে দেশে শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা হোক।

প্রধানমন্ত্রী হাসিনা আরো নানাভাবে দিনবদলের অঙ্গীকার পালন শুরু করতে পারেন ছোট ছোট কাজ দ্বারাই। তিনি ব্রিটেন ও ভারতের নজির অনুসরণ করে প্রত্যেক মন্ত্রীর এমনকি প্রতিমন্ত্রীর জন্যও (মন্ত্রিসভা তো আজকাল মাশাল্লা ঢাউস আকৃতির হয়) পতাকা শোভিত আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা বাতিল করে শুধু সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য অনেকের জন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিতে পারেন। তাতে পেট্রল খরচসহ অনেক খরচই বিপুলভাবে বেঁচে যাবে।

আরেকটি কথা, মন্ত্রীরা যেন কথায় কথায় বিদেশ সফরে না যান। একটি গরিব দেশের মন্ত্রীদের অকারণ ভ্রমণ-বিলাসিতা শোভা পায় না। প্রয়োজনের বাইরে একজন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সাংসদ যাতে সরকারি খরচে যখন-তখন বিদেশে না যান, প্রধানমন্ত্রী তার কঠোর ব্যবস্থা করুন। এবারেও বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের কোনো কোনো মন্ত্রী যে কারণে বিদেশে ছুটেছেন তা যে ছিল তুচ্ছ কারণ, আমি বিদেশে বসেও তার প্রমাণ দিতে পারি। তবে এত শিগগিরই দিচ্ছি না এই কারণে যে, তাদের সতর্ক হওয়ার জন্য কিছুদিন সুযোগ দেওয়া উচিত। দেশের নির্বাচিত সরকার এবং তাদের অধীনস্থ প্রশাসনকে কীভাবে দিনবদলের অঙ্গীকার পালনের লক্ষ্যে আরো জনমুখী করে তোলা যায়, সে সম্পর্কে জননেত্রীর কাছে আরো কিছু সুপারিশ জানাতে চাই। আজ নিবন্ধটি বেশি বড় হয়ে যাবে, সেই ভয়ে এখানেই ক্ষান্ত দিচ্ছি। ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগমতো তা নিয়েও আলোচনার ইচ্ছে রইল।